অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির ইতিহাস: বিংশ শতক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পি. এইচ.ডি
উপাধি লাভের জন্য উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

অমিয় কুমার বাউল

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: JU/PHD/History/A00HI0501716

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

২০২২

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির ইতিহাস : বিংশ শতক

সারাংশ

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি দীর্ঘ সময়ের গবেষণার ফসল হিসাবে উপস্থাপন করা হল **"অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির ইতিহাস : বিংশ শতক"** শিরোনামে। বাংলার জাতি কাঠামোয় কৈবর্তরা এমন একটি জাতি যাদের কর্মকান্ডের একটা দীর্ঘকালীন ইতিহাস আছে। যারা প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে বাংলায় রাজদণ্ড হাতে শাসন করেছে। আবার ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক আন্দোলনে, বিশেষত বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অন্যদিকে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারেও এই জাতি ঔপনিবেশিক তথা তার আগে থেকেই মেদিনীপুর তথা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি সেই বিবরণ তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলায় কৈবর্তদের সংখ্যা আনুমানিক মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু এই জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত কোন ইতিহাস লেখা হয়নি। এখনও এই জাতির বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজে নিযুক্ত। এমনকি এই জাতি আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে এখনও পিছিয়ে পড়া একটি জাতি। তারা তাদের নিজেদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ততটা সচেতন নয়, একইসঙ্গে সংগঠিতও নয়। ঐতিহাসিক, গবেষক মহলও তাদের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তবে অতি সম্প্রতি বাংলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছে এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে। তাই এই সন্দর্ভে কৈবর্ত জাতির কর্মকান্ডের অনালোচিত, অ-চর্চিত বিষয়গুলি মাথায় রেখে কৈবর্ত জাতির একটি পূর্ণাংগ ইতিহাস পুনর্লিখন ও পুননির্মাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে বাংলার কৈবর্ত জাতি বিশেষত মেদিনীপুর জেলার

কৈবর্তদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক পরিচিতি, সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিশ শতকের শেষ কয়েকটি দশক থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের প্রথম দুই দশকে ভারত ইতিহাসের গবেষণার ক্ষেত্র নতুন নতুন দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে। শুধুমাত্র রাজকাহিনীর ইতিহাস লেখার গন্ডী ছেড়ে একবিংশ শতকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত সমস্যাগুলি নিয়ে এমনকি আঞ্চলিক বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে বিস্তারিত চর্চা ও গবেষণা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাই নতুন নতুন বিষয় বৈচিত্র এখন নতুন নতুন তথ্যে, তত্ত্বে ও বিশ্লেষণের নানান ভঙ্গীর দ্বারা আজ ইতিহাসচর্চা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় জাতপাত ব্যবস্থা বিদ্যমান বহুকাল আগে থেকেই। তবে সমাজের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সময়ে। ঔপনিবেশিক আমলের ভারতের সামাজিক বিন্যাস একরকম। আবার প্রাচীনকাল বা ঋকবৈদিক যুগ বা পরবর্তী যুগে সমাজে বর্ণব্যবস্থার রূপ বা বৈশিষ্ট্য আরেক রকমের ছিল। বর্তমানে জাতি নেশন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু অন্য অর্থে সামাজিক জাতব্যবস্থায় জাতি বলতে একই গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন মানুষকে একটি জাতি বা জনজাতি বোঝায়। যেমন কৈবর্ত জনজাতি। ১৮৭২ সালের জনগণনার সময় থেকে বিভিন্ন জাতির বিবরণ সরকারি ভাবে আমরা পাই। এছাড়া সমকালীন ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু বা অন্যান্য লেখকদের দ্বারা বাংলার জাতব্যবস্থার বেশকিছুটা পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

১৮৭২ সালে যখন জাতিভিত্তিক, পেশাভিত্তিক জনগণনা শুরু হয় তখন থেকে আমরা বিভিন্ন জাতির মোটামুটি একটা পরিসংখ্যান লক্ষ্য করতে পারি। তেমনই কৈবর্ত জাতির ক্ষেত্রে প্রতিটি জনগণনায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যা পরিলক্ষিত হয়। আবার ১৯৩১ সালের পরে জাতিভিত্তিক আলাদা আলাদা নির্ঘন্ট পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র জেলে কৈবর্তদের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। তবে ঔপনিবেশিক আমলের আদমশুমারিগুলিতে দেখা যায় এই কৈবর্ত জাতি বাংলা প্রদেশে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিচিত আর দ্বিতীয় স্থানে দেখা যায় নমঃশূদ্র জাতিকে। স্বাধীনতা পরবর্তী জনগণনাগুলিতে আর জাতিভিত্তিক সমীক্ষার উল্লেখ না থাকার ফলে তার বিশদ বিবরণ সেভাবে পাওয়া যায় না। বিশেষত ১৯৩১ এর পর আমরা সেভাবে আলাদা আলাদা করে জাতির বর্ণনা পাই না। তবে রাজনৈতিক কারণে সামাজিক আন্দোলনকে স্তিমিত করে দেওয়ার একটি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে এই জাতির মধ্যে একটি বিভাজনের সৃষ্টি করা হয়। একইসঙ্গে পরবর্তী সময়ে সেরকম কোন যোগ্য নেতৃত্বও লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলায় এখনও পর্যন্ত নৃতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষা উপযুক্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা কিছু নূতন পরিভাষার ব্যবহার শুরু করতে পারি। প্রথমত, বর্তমানে বহুচর্চিত বিষয় হল social exclusion. এই শব্দ প্রচলিত হয়েছে কেননা social exclusion studies UGC দ্বারা স্বীকৃত একটি বিষয় হয়েছে গত কয়েক বছর হল এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পঠন পাঠন চলছে। এছাড়া ১৯৯০-এর দশক থেকে টাটা ইনস্টিটিউট অফ্ সোশ্যাল সায়েন্সেস(TISS)-এ সেন্টার ফর স্টাডি অফ সোশ্যাল এক্সক্লুশেন অ্যান্ড ইনক্লুসিভ পলিসিস বিভাগ রয়েছে। আবার USPSWA রয়েছে যার উদ্দেশ্য হল তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর জাতির উন্নয়নের জন্য

গবেষণা করা, তেমনই সেন্টার ফর দলিত অ্যান্ড ট্রাইবাল স্টাডিজ রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতেও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেস এর অধীন সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডিসক্রিমিনেশন অ্যান্ড এক্সক্লুশেন(CSDE) স্থাপিত হয়েছে। আমাদের কাছে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কেননা দেখা যায় যে নানা জাতি ও উপজাতি আধুনিক যুগে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের পর থেকে দুইটি পন্থায় উন্নীত হয়েছে, এবং নিজেদের জাতিভিত্তিক উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ সূচক তালিকায় আরো উঁচুতে স্থান দাবী করেছে। এই দুইটি পথের একটি হল তথাকথিত উচ্চতর জাতি বা প্রজাতির (caste or sub-caste) অনুকরণ বা অনুগমন করা। যথা, ভূমিজরা এই ধারায় পশ্চিমবঙ্গে কিছু উচ্চতর জাতি অনুকরণ করেছে, যথা সামাজিক উৎসবে নারী-পুরুষ মিলিত নৃত্যগীত পরিত্যাগ করা, মদ্যপান ও মাদকদ্রব্য পরিহার করা, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দ্বারা নিয়োজিত পুরোহিতদের ভূমিজ উৎসবে পৌরোহিত্য করার দায়িত্ব দেওয়া, বিবাহকালে নিজ নিজ জাতি সমাজের নিয়ম মেনে নেওয়া ইত্যাদি। এইসব ক্ষেত্রে তথাকথিত নীচু জাতি উচ্চতর জাতির সামাজিক ও ধার্মিক আচার ব্যবহারের অনুকরণ করে বা অনুগমন দ্বারা উচ্চবর্ণের হিন্দু আচার ব্যবহারের সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জন করে। এইভাবে, অনেক নৃতাত্ত্বিকের মতে হিন্দু সমাজ বহির্ভূত নানা প্রজাতির কালক্রম নিজেদেরকে হিন্দু সমাজের অন্তর্গত করে নেয়, যদিও পুরাকালে তাদের সেই অবস্থান ছিল না অথবা তর্কাতীত ছিল না। যাই হোক তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতি বা প্রজাতি উন্নতির আরেকটি পন্থা ছিল সেটা হল নিম্নবর্ণস্থ অবস্থানের বিরুদ্ধতা করে বিপ্রতীপ পন্থায় নিজ অবস্থান স্থির করা। এইখানে মনে রাখতে হবে যে social exclusion অথবা সামাজিক বিপ্রকর্ষণ হিন্দু সমাজে জাতির স্থান নির্দেশে একটি পন্থা। সেই পন্থায় কোন জাতি বা প্রজাতি নিজেদের বিপ্রকর্ষিত বা

excluded অবস্থান মেনে নিয়ে নিজেদের অভিধা, জাতীয় ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সেই ভিন্নতার সংজ্ঞা (definition) অনুসারে ক্রমে নির্ণীত হয়। যথা দেখা যায় পূর্ব বঙ্গে নমঃশূদ্র জাতি নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী কোন উচ্চতর জাতির অনুকরণ না করে নিজেদের ভিন্নতর আত্মপরিচিতি তৈরী করে। সুতরাং দেখা গেল এই আরেকটি পন্থা অর্থাৎ বিপ্রতীপ পথ একদিকে, যে পথ নিয়েছে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়। অপরদিকে দেখা যায় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পথের অনুগমন করেছে কোন কোন জনগোষ্ঠী, যথা, পশ্চিমবাংলার ভূমিজ জাতি। বঙ্গদেশে তথা মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তরা বিভিন্ন নামে পরিচিত। তারা কৈবর্ত, মাহিষ্য, হেলে কৈবর্ত, জেলে কৈবর্ত ইত্যাদি নামে পরিচিত। জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে উপরোক্ত দুটি প্রবণতাই দেখা যায়। একদিকে অনুগমনের পথ, যে পথে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সমকক্ষতা দাবী করা চলে। যথা- যারা নিজেদের মাহিষ্য নামে পরিচিতি দিয়েছে অনেক সময় এবং অপরদিকে বিপ্রতীপ পন্থায় অনেকে নিজেদের জেলে কৈবর্ত নামে পরিচিতি দিয়ে চাষী কৈবর্তদের(মাহিষ্য) চেয়ে নিম্নস্থানে অবস্থান করেছে। অষ্টাদশ শতক থেকে দেখা যায় যে কৈবর্ত জাতির একটি অংশ একদিকে যেমন তাদের নিজেদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দরুণ (যথা মৎস্যজীবিদের যা করণীয়), অন্য অংশ সাধারণ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর নিত্যকৃত চাষাদি করে সাধারণ কৃষিজীবীদের অংশই থেকে গেছে। এই দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীকে চাষী কৈবর্ত এবং প্রথমটিকে জেলে কৈবর্ত অভিধা দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় বাংলা প্রদেশের একটি আদিম জনগোষ্ঠী কৈবর্তদের উদ্ভব, পরিচিতি, অবস্থান, জাতি পরিচয়, জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়গুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বিশ্লেষণধর্মী

আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় বাংলা প্রদেশের বিশেষত: অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জনগোষ্ঠীর ওপরই আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা আঞ্চলিক ইতিহাস বা local historyর অন্তর্গত হলেও গবেষণা প্রশ্নে বাংলার ইতিহাসে নিম্নজাতির অবস্থান সম্পর্কে নানা নতুন প্রশ্নের অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে বর্তমানের মার্ক্সীয় ও সাব-অলটার্ন ঐতিহাসিকরা ইতিহাসে প্রান্তিক গোষ্ঠীর অবদান সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তবক্ষেত্রে কৈবর্তদের ইতিহাস অনুসন্ধান ও প্রশ্নের মাধ্যমে বর্তমান গবেষক বহু অনালোচিত দিককে তুলে ধরেছে। যেমন –

১. বাংলার ইতিহাসে উল্লেখ্য সময়কালে কৈবর্তদের আত্মপরিচয় কিভাবে নির্মিত হল?

২. আত্মপরিচয় নির্মিতি তাদের ক্ষমতায়নকে কতদূর প্রতিষ্ঠা দিল?

৩. এই আত্মপরিচয় ও ক্ষমতায়নের সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক জাতীয়তা ও স্বাধীনতা-পূর্বের রাজনীতির কি সম্পর্ক ছিল?

৪. সংঘবদ্ধতার অভাব কি কৈবর্তদের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য না কি স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষের দিকে জাতি ইতিহাসের নানা জটিলতার কারণে তারা ক্রমশ পশ্চাৎপর হতে শুরু করেছিল?

৫. ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পর মেদিনীপুরের কৈবর্তরা কলকাতার অভিজাত নাগরিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে কি ক্রমাগত হার মানে?

৬. সেই সময়ের প্রেক্ষিতে বর্তমানে কৈবর্তদের অবস্থান কোথায়?

গবেষণার পরিধি ও সময়সীমা:

এই গবেষণা সন্দর্ভটি ভৌগোলিক দিক থেকে ঔপনিবেশিক বাংলার বিশেষত পশ্চিম অংশের সমুদ্রউপকূলবর্তী বৃহত্তম জেলা অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার

মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। যদিও ২০০১ সালে এই জেলা বিভক্ত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর নামে দুটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে। আবার ২০১৭ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এলাকা নিয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা গঠিত হয়েছে। কিন্তু অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলাই আমার গবেষণার ক্ষেত্র।

গবেষণাকর্মের সময়কাল বিংশ শতক। সময়কাল বিংশ শতক করার কারণ হল পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনে বিংশ শতকের শুরু থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে কৈবর্তদের সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। বিশেষত জাতীয় কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়। কৈবর্তদের আধুনিক ইতিহাস এই সময়কাল থেকেই জানা যায়। এই পুরো শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে কৈবর্তদের জীবনচর্যা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডকে বিশ্লেষণ করা, বিশেষত বিংশ শতকে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অবদানকে তুলে ধরা এবং একইসঙ্গে আদমশুমারি ভিত্তিক কৈবর্ত জাতির পরিসংখ্যানকে বিশ্লেষণ করাও আমার এই গবেষণাকর্মের লক্ষ্য।

গবেষণার পদ্ধতি ও উপাদান:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি নির্মাণে বেশকিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রথমে জাতিচর্চা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার, লেখ্যাগার, জাতি সংগঠনের কার্যালয়, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার সংগৃহীত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে সঠিক শব্দচয়নের মাধ্যমে গবেষণা কাজ সম্পূর্ণ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণার মূল উপাদানগুলি হল – যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইতিহাস বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার ও সেখানকার আদমশুমারির রিপোর্টগুলি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা লাইব্রেরী, নিমতৌড়ী স্মৃতিসৌধ পাবলিক লাইব্রেরী, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার লাইব্রেরী, নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, ঝাড়খন্ড লোক-সংস্কৃতি পরিষদ, ডায়মন্ড হারবার চাষী কৈবর্ত সমাজের কার্যালয় ও লাইব্রেরী, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ লাইব্রেরী এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেকের কাছ থেকে নানারকম তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক প্রদর্শনী মেলা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। এমনকি ইন্টারনেট থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস:

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটি কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের **ভূমিকায়** সমাজের নিম্নবর্ণের ইতিহাসচর্চা কবে থেকে শুরু হল এবং গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি ও অধ্যায় বিন্যাস দেখানো হয়েছে। আর **প্রথম অধ্যায়ে** কৈবর্ত জাতির উৎপত্তি, পরিচিতি ও বাংলার জাতি কাঠামোয় কৈবর্তদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে বিশেষত ঔপনিবেশিক আমলের ও তার পূর্বের তথ্যের ভিত্তিতে কৈবর্ত জাতির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** দেখানো হয়েছে জনগণনার নিরিখে কৈবর্ত জাতির পরিসংখ্যান, বিশেষত ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত। কেননা পরবর্তীতে জনগণনাগুলিতে জাতিভিত্তিক বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ হত না। স্বাধীনতা পরবর্তীতে শুধুমাত্র তপশিলিভূক্ত জাতি হিসাবে জেলে কৈবর্তদের সংখ্যা পাওয়া যায়। সেগুলিকেই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই ১৮৭২ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত বাংলা প্রদেশে এবং অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলায় কৈবর্তরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। মূলত সেই সংখ্যাতত্ত্বের বিশ্লেষণই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এই সন্দর্ভের **তৃতীয় অধ্যায়ে** কৈবর্তদের রাজনৈতিক জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। সুদূর অতীতে কৈবর্ত রাজাদের রাজদণ্ড হাতে রাজ্য শাসন থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক আমলে বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদান ও বিভিন্ন কার্যকলাপে কৈবর্তদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ লক্ষ্য করার মতো। এমনকি গান্ধীবাদী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে মেদিনীপুরের কৈবর্ত মনীষীদের আত্মত্যাগ উল্লেখযোগ্য। কৈবর্ত সমাজের শত-সহস্র নরনারী তাদের জীবনকে তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে তরান্বিত করেছিল। এই গবেষণা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে কৈবর্তদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত ১৯২০-র দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকে সংগঠিত হওয়া সকল গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা তথা সেখানকার আন্দোলনে নিযুক্ত কৈবর্তদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই অধ্যায়ে বিংশ শতকে মেদিনীপুর তথা বাংলায় সংগঠিত বিভিন্ন আন্দোলনে কৈবর্তদের অবদানকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার বিশেষত মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত জাতির মানুষজনের নেতৃত্বদান ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের যে তাৎপর্য

তা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তাই মেদিনীপুর তথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কৈবর্তদের সংগঠিত আন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যদিও উচ্চবর্গীয় রাজনীতির নানা জটিলতার কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে তাদের এই অগ্রগতি সেইভাবে বজায় থাকেনি। তবে এর জন্যে অবশ্যই দায়ী ছিল কৈবর্ত নেতাদের মধ্যেকার বিভেদ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব। সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ উচ্চনীচ অনুক্রমের কারণে সামগ্রিকভাবে কৈবর্ত জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ফলস্বরূপ জাতির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সকলের সমহারে উন্নতি ঘটানো সম্ভবপর হয়নি। এছাড়া বাংলার রাজনীতিতে কেন্দ্রিকতা বনাম আঞ্চলিকতার টানাপোড়েনে নগরকেন্দ্রিক আবর্তেরই জয়লাভ ঘটেছে। এর ফলে একদিকে যেমন আঞ্চলিক রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আবার তেমনই কৈবর্তদের সামগ্রিক উন্নয়নের গতিতেও ভাটা পড়েছে। স্বাধীনতার পরে কৈবর্ত জাতির ইতিহাস সেই সাক্ষ্য বহন করে।

বিংশ শতকের শুরু থেকে মেদিনীপুরে ঘটে যাওয়া প্রায় সমস্ত আন্দোলনেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র কৈবর্ত জাতি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিল যার প্রমাণ ব্রিটিশ সরকারের নথিতেও পাওয়া যায়। কৈবর্তরা ছিল সমগ্র বাংলা প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি এবং সারা ভারতের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই জাতির মানুষের বাস সবচেয়ে বেশী। সংগ্রামী জীবন যে জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সুশীলকুমার ধাড়া, সতীশচন্দ্র সামন্ত, কুমারচন্দ্র জানা প্রমুখ নেতৃত্ববৃন্দকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। যা আজও ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজ

করছে। অথচ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে কৈবর্তদের একতা ও জোটবদ্ধ না হওয়ার কারণে তারা তাদের জাতির কল্যাণে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে বা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে বিশেষ তৎপর হয়নি। অথচ ইংরেজ শাসন উৎখাত করার প্রয়াসে এই কৈবর্ত জাতির অগ্রগণ্য ভূমিকা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কয়েকজন কৈবর্তনেতা সরকারে অংশ নিলেও তারা নিজেদের জাতির উন্নয়নে বিশেষ তৎপর হয়নি।

আর **চতুর্থ অধ্যায়ে** বাংলা প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৈবর্ত জাতির সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক বিবর্তন তথা ধর্মীয় জীবনচর্যা ও কৃষ্টিকে নিপুণভাবে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই অধ্যায়ে। বাংলা ছিল কৌম সমাজের দেশ। এই সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতেন। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র – এই ভাগ বাংলার আদিবাসী কৌম সমাজে ছিল না। আর গোত্র-পদবীও ছিল না। সেখানে ভেদাভেদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সমাজের প্রয়োজনে উৎপাদনকাজে অংশ নিতে যে যার খুশি বৃত্তি অবলম্বন করত। স্বভাবতই প্রতিটি কাজ ছিল সমান মর্যাদার। পরবর্তীকালে বাংলায় আর্যদের আগমনে বাংলার আদিম কৌম গোষ্ঠীরা তাদের সাথে পরাজিত হল এবং সামাজিক নিয়ম, রীতিনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে আর্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করল। এইভাবে ধীরে ধীরে জাতিভেদ প্রথার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ল বাংলার সমাজ ব্যবস্থায়। আর্যরা চতুবর্ণকে টিকিয়ে রাখার জন্য জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের সংযোগ ঘটিয়ে জাতপাত ব্যবস্থাকে সংস্কারে পরিণত করল বিশেষ শ্রেণী স্বার্থে। বৈদিক আর্য সমাজের রীতিনীতি ধীরে ধীরে বাংলার আদিম সমাজ ব্যবস্থাকে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলল। এককথায় তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। নদীয়ার সংস্কৃত পণ্ডিত

যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছেন পৃথিবীর আর কোথাও এমন জাতিগত বিভাগ নেই একমাত্র বাংলাই তার একমাত্র উদাহরণ। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত 'দ্য হিন্দু কাস্টস অ্যান্ড সেক্টস' গ্রন্থে তিনি বলেছেন- 'The institution of caste is a unique feature of Hindu society and as nothing exactly like it is to be found in any other part of the world'.

বাংলার সমাজে বহুকাল থেকেই অস্পৃশ্যতা লক্ষ্য করা যায়। আর এই অস্পৃশ্যতা জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার এক অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুত ব্রাহ্মণ্যবাদীরাই শতাব্দীর পর শতাব্দী কিছু মানুষকে নীচ, অস্পৃশ্য করে রাখার বিধানগুলো জবরদস্তভাবে কায়েম রেখেছে। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে সামাজিক প্রভুত্বের অধিকারী ব্রাহ্মণদের রীতিনীতিতে গঠিত জাতি-বর্ণ ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে সামাজিক মেলামেশা আর পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে আসছে। ব্রাহ্মণদের অনুসৃত আদর্শে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উঁচু জাতিগুলো তাদের চেয়ে নিম্ন সারির জাতিগুলোর প্রতি তাদের মনোভাব নির্ধারণ করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্বের মাপকাঠিতে চিহ্নিত হীন জাত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষদের পেশা, খাদ্য, পোশাক, ভাষা, আচার ব্যবহার যেহেতু বর্ণ হিন্দুদের চেয়ে পৃথক, তাই তারা আজও অস্পৃশ্য অশুচি। বর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নির্মল কুমার বোস তাঁর 'হিন্দু সমাজের গড়ন' গ্রন্থে বলেছেন- বর্ণ ব্যবস্থার মূলে একটি বুদ্ধি ছিল, মানুষ সমাজের দাস। সমাজের জন্য নির্ধারিত সেবা করে কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী স্বীয় জীবন যাপন করে থাকে। সমাজকে তারা দেখে ও সমাজও তাদের দেখে। এক্ষেত্রে অধিকার ও দায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজবিজ্ঞানী দেবী চ্যাটার্জী তাঁর 'ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে জাতি-বর্ণ সমীকরণ' প্রবন্ধে দেখান বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের যাত্রাপথ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে; আর্থ-সামাজিক

ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাপ খাওয়াতে খাওয়াতে এগিয়ে চলেছে। ঋগ্বেদের সময়কালে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার সূচনা হলেও সম্ভবত তার নিয়মনীতির কঠোরতা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা পায়। মনে করা হয়, প্রাথমিক পর্যায়ে জাতিদের মধ্যেকার সীমারেখাগুলি ছিল অনেকটাই নমনীয়, বংশগত পেশা-র ধারণা শিথিল।

অতুল সুর তাঁর 'বাংলার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়' গ্রন্থে বিভিন্ন জাতির মাথার বিন্যাস ও নাসিকার দৈর্ঘ্য, দেহের দৈর্ঘ্য পরিমাপ সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কৈবর্ত জাতির শিরাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৭.৫ এবং নাসিকাকার-জ্ঞাপক সূচক-সংখ্যা ৭৬.৬। আর তাদের উচ্চতা বা দেহদৈর্ঘ্য ১৬২.৯ সে.মি.। আবার অন্যদিকে আমরা বাংলার বিভিন্ন জাতির শির ও নাসিকার সূচক-সংখ্যা সমূহের দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। এখানে কৈবর্ত, গোয়ালা ও পোদেদের বিস্তৃত শিরস্কতা অনেক কম, কিন্তু নাক বেশী প্রসারিত এবং দেহদৈর্ঘ্য গোয়ালাদের অপেক্ষা কৈবর্তদের কম। আবার কৈবর্তদের চেয়েও কম পোদেদের। যদিও রাজবংশীদের নাক কৈবর্তদের সঙ্গে সমানভাবে প্রসারিত। তথাপি তারা নাতিদীর্ঘ শিরস্ক ও কৈবর্তদের চেয়ে দেহদৈর্ঘ্যে অনেক খাটো। তবে নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের সামান্য হেরফের থাকলেও কয়েকটি বিশেষ জাতির মধ্যে আমরা একটা নৃতাত্ত্বিক ঐক্য লক্ষ্য করতে পারি। যেমন – কৈবর্ত, গোয়ালা ও পোদ জাতি একই শ্রেণিভুক্ত। এদের মধ্যে প্রায় একইরকম বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আবার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২) তাঁর নৃপরিমাপমূলক (Anthropometric) গবেষণায় বাংলার আদিম জাতিগুলির জনতত্ত্ব ও বিন্যাস তুলে ধরেছেন। তিনিও কৈবর্ত জাতির নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

বাংলার সমাজচিত্র কিছু সাহিত্যিকের কলমে উঠে আসে যা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। উনবিংশ ও বিংশ শতকে বেশকিছু লেখক ও সাহিত্যিক যারা সমাজ সচেতন, সমাজের প্রান্তিক মানুষজনের কথা; তাদের যন্ত্রণার বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাদের লেখনীতে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৪-১৯৫০) পথের পাঁচালি(১৯২৮), আরণ্যক(১৯৭৬); মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯০৮-১৯৫৬) পদ্মানদীর মাঝি(১৯৩৬); তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৮-১৯৭১) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা(১৯৪৭); দেবেশ রায়ের তিস্তাপারের বৃত্তান্ত(১৯৮৮) থেকে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের সমাজচিত্র উঠে আসে। আবার মাণিক বন্দ্যোপাধায়ের মতো অদ্বৈত মল্লবর্মণের(১৯১৪-১৯৫১) তিতাস একটি নদীর নাম(১৯৫৬), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের(১৮৭৬-১৯৩৮) অভাগীর স্বর্গ(১৯২৬); দীনবন্ধু মিত্রের(১৮৩০-১৮৭৩) নীলদর্পণ; মহাশ্বেতাদেবীর (১৯২৬-২০১৬) কৈবর্তখন্ড, বাণ, ডোম, পাখমারা, মাল, ওঝা, সাঁওতাল প্রভৃতি গল্প আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় সমাজের বিবস্ত্র চেহারা। এককথায় এই সমস্ত লেখায় সমাজের নিম্নবর্গীয় মানুষের ইতিহাসের প্রতিফলন ঘটেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জীবনের আর্থিক দুরবস্থার ঘন কালো মেঘ এবং জীবন সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে। তাদেরকে কঠিন সংগ্রাম করে আর্থিক সবল মানুষের সঙ্গে লড়াই করে তাদের জীবন তরী বাইতে হয়। তাদের জীবনে তথাকথিত নাগরিক জীবনের মেকি সভ্যতার স্পর্শ নেই, রাজনীতির কুটকচালি নেই, আছে শুধু নিম্নবর্গীয় সমাজের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনের জীবিকার সংগ্রাম। আবার মাঝে মাঝে প্রকৃতির বীভিৎস রূপ তাদের নদীকেন্দ্রক জীবনকে নাঝেহাল করে দেয়। এই উপনুয়াসে দেখতে পাই-

কখনো কখনো দুর্যোগের বিরুদ্ধে ঝাড়া তিনদিন লড়াই চলে। শেষে জেলেরা ঝিমাইয়া পড়ার আগেই দুর্যোগ নিজেই ঝিমাইয়া পড়ে। যে বাতাস দৈত্যের নাসিকা গর্জনের মতো বহিতেছিল, তাহা এখন প্রজাপতির পাখার হাওয়ার মতো কোমল হইয়া গেল। মেঘনার বুকের আলোড়ন থামিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।[৭] এখানে তিস্তাপারের জেলেরা কিভাবে কষ্টের মধ্যে মাছ্ ধরতে যায় তাঁর বিবরণ ও সেইসঙ্গে তাদের নামের সঙ্গে জাতের বিবরণ থেকে সমাজচিত্র জানা যায়। তেমনি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পন নাটকে নীলকর সাহেবদের চরম অত্যাচারের বহিঃপ্রকাশ ও সেখানে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস ও অন্যান্য কৈবর্ত নেতা-সহ সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে।

ভারতবর্ষ নানা জাতের মানুষের বাসভূমি। সেই সমস্ত জাতিগুলো নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে আজও টিকে আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ আরো বাড়িয়ে তুলছে। প্রথমেই বলা যেতে পারে ভারতের মতো পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত কঠোর জাতিভেদ ব্যবস্থা আছে কিনা সন্দেহ। তাহলে ভারতে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন কি সম্ভব? এ প্রশ্ন আমাদের মনে বার বার দানা বাঁধে। প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে – 'মনুষ্যগণ স্বভাবত বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত এবং জাতিগত বিশেষত্ব বিলুপ্ত হইবার নহে। .....প্রাথমিক অবস্থায় সকল মানবই এক জাতীয় ছিল। ..... পৃথিবীর জাতীয় মানবের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর বিশেষ কোন অঞ্চলে, একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবের অধীনে উৎপন্ন ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল'। আসলে যে জাত ব্যবস্থা ভারতে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছে তাঁর বিলোপ সাধন সম্ভব কিনা তাঁর উত্তরে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। তবে যে জাতব্যবস্থার বিলোপের জন্য বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু শত চেষ্টা করেও নির্মূল করতে পারেননি। এমনকি পরবর্তী সময়ে মুসলমান শাসন ও ইংরেজ শাসনেও তাঁর অবসান ঘটেনি। আমাদের সমাজে বিভিন্ন সময়ে বহু মনীষী বা সমাজ সংস্কারকেরা এই জাতব্যবস্থার ওপর কুঠারাঘাত করেছেন কিন্তু সমাজ থেকে এর বীজ উপড়ে ফেলতে পারেননি। প্রথমত, আমাদের সমাজে বৃত্তিভিত্তিক জাতব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ পরিবারভিত্তিক বা বংশভিত্তিক বৃত্তি জাতব্যবস্থার ভিতকে শক্ত করেছে। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে, শিল্পের অগ্রগতির ফলে জাতভিত্তিক বৃত্তি অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। এখন পরিবারভিত্তিক বৃত্তি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানে একই পরিবারের পাঁচজন বুদ্ধি, গুণ ও সুযোগ সুবিধার জন্য পাঁচরকম বৃত্তি অবলম্বন করতে পারছে। ফলে জাতব্যবস্থার কঠোরতা অনেকটা কমে আসছে। দ্বিতীয়ত, ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে হলে, জাতীয় সংহতিকে দৃঢ় করতে হলে জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো ছাড়া কোন রাস্তা নেই। তাই ভারতীয় সমাজে বংশগত আভিজাত্য, বর্ণগত আভিজাত্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজে সাম্যতা আনার জন্য জন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। প্রাচীনকালে যেমন গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে পেশা অর্জন করতে পারতেন তেমনই আজও বর্ণ বা শ্রেণী অনুসারে কোন তারতম্য না রেখেই তা সম্ভব। তবে ভারতীয় সমাজে উচু-নীচু বর্ণ, তাদের পদবীগত আভিজাত্য বা গর্ব ত্যাগ করা প্রয়োজন। বর্তমানে পদবী ব্যক্তির, বংশের আভিজাত্য বা বংশ বা জাতি পরিচয় বহন করে। তাই এই পদবী ত্যাগ করে জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত সম্ভব হতে পারে। তৃতীয়ত, সামাজিক বিবর্তনে মানুষ পেশাগত কারণে, পরিবেশ বা শিক্ষার সুযোগের তারতম্যের কারণে সমাজে এগিয়ে যায় অথবা পিছিয়ে পড়ে। যদিও ব্যক্তিবিশেষে সকলের বিদ্যা, বুদ্ধি, বিচারশক্তি, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অর্জনের সামর্থ্য সকলের সমান হয়

না। তবে সবরকম সুযোগ পেলে সকল শ্রেণীর মানুষই সমান সামর্থ্য দেখাতে পারে। অর্থাৎ দারিদ্রতাই মানুষের এই জাতপাতের শিকার হওয়ার অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন মন্তব্য করেছেন তার গবেষণায়। সেখানে তিনি বলেছেন ব্রিটিশ সরকারের নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণই ছিল এর গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[৯] এখানে কোন বংশগত আভিজাত্য থাকতে পারে না। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য চাই শিক্ষা, সচেতনতা ও সামাজিক মর্যাদা। তবেই জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন সম্ভব। চতুর্থত, বর্তমানে প্রচলিত একই জাতের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানাভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সেখানে যোগ্যতা ছাড়াও বিশেষভাবে জাতি, উপজাতি, গোত্র ও নির্দিষ্ট বর্ণের উল্লেখ করা থাকে। ফলে জাতপাত ভেদাভেদকে কঠোর করার একটি পাকাপাকি রাস্তা অটুট রয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য স্থানীয় অনার্য তথা লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে আর্যদের বিরোধের সূত্রপাত। উত্তর ভারতীয় আর্যভাষীরা অনিবার্য সামাজিক কারণে অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের জন্য বাংলার তথাকথিত কৌমের বাসিন্দা বা দস্যুদের অধিকাংশ মানুষকে তাদের কল্পিত অজুহাতে শূদ্র পর্যায়ে ঠেলে দেয়। তাঁর বাইরেও বহুসংখ্যক মানুষকে এই সংস্কৃতির বাইরে রেখে দেওয়া হয়। সমাজে সব সময়ই সাধারণ ও অনুন্নত দুর্বল মানুষরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই সমাজের মুষ্টিমেয় আর্থিক বলবান মানুষদের সেবা করেও যথেষ্ট মর্যাদা পেত না। উপরন্তু তাদেরকে সমাজের বাইরে অস্পৃশ্য ও ব্রাত্য করে রাখা হত। এই মুষ্টিমেয় শ্রেণীই সমাজ ব্যবস্থার নীচের দিকে শূদ্র রূপে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তাদেরই পূজা-অর্চনা, উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে আর্য রঙে রাঙিয়ে সেখান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এখন আমাদের মনে

প্রশ্ন জাগতে পারে আর্য পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস কেমন ছিল, তারা কোন কোন দেবদেবীর পূজা করত? বাংলার আদিম অধিবাসীরা বছরের বিভিন্ন সময়ে যে উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি পালন করত সেগুলির অনেককিছুই আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মে কিছুটা বা সংস্কার করে বা কিছু কিছু অপরিবর্তিত রেখেই গৃহীত হয়েছে। সেজন্য আদিম অধিবাসী উপজাতিদের পালন করে আসা লৌকিক আচার অনুষ্ঠানগুলি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানা পূজা অনুষ্ঠানেও পরিলক্ষিত হয়।

সবশেষে উপসংহারে বলা হয়েছে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কৈবর্তজাতির অবস্থান এবং তাদের উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা। স্বাধীনতার পরে সংবিধান রচনা ও পরবর্তী সময়ে পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সময়ে সরকারি উদ্যোগে কমিশন গঠিত হয়েছে। তার দ্বারা কৈবর্ত-সহ অন্যান্য অনগ্রসর জাতিগুলি কতোটা উপকৃত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে দ্বিখন্ডিত কৈবর্তদের দুটি অংশের একটিকে তফশিলী জাতি ও অন্যটিকে অনগ্রসর জাতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা তথা পশ্চিমবঙ্গে বিংশ শতকের শেষ দশকে দ্বিতীয় অংশটির মধ্যে চাষী কৈবর্তদের অনগ্রসর জাতির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কিন্তু চাষী কৈবর্তদের মধ্যে মাহিষ্য নামাঙ্কিত (কৈবর্ত) জাতিকে উন্নত জাতির অজুহাতে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দ্বিতীয় অংশটিও নিজেদের অনগ্রসর হিসাবে ঘোষণার দাবী জানিয়ে আসছে। সারা বাংলা জুড়ে কৈবর্তদের বিভিন্ন সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার হতে শুরু করেছে। বিভিন্ন নথি ও সূত্রের ভিত্তিতে তাদের বক্তব্য দুটি ভাগ হলেও তা একটি জাতিরই অংশবিশেষ। এই অধ্যায়ে সেই সমস্ত ঘটনারই ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা জানি জাতপাতের ভেদনীতি সমাজকে দুর্বল করে তোলে। তাই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জাতপাত বিভেদকে দূরে সরিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদান ও জাত বর্ণ নির্বিশেষে সম্মানিত না হলে জাতপাত ব্যবস্থার প্রতিষেধক গড়ে তোলা অসম্ভব। প্রচলিত নীচুজাতের মানুষের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য নয়, করুণা প্রদর্শন নয়, মনুষ্যত্বের সমান মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমেই পারস্পরিক জাতপাতভিত্তিক বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব। তাই আশা করা যায় প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের ফলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ন্যায়বুদ্ধি ক্রমশ বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রেণীগত বৈষম্য দূর করা যেতে পারে। আর মানব সমাজের বিচারের মূল জন্মগত নয়, শিক্ষা, চর্চা, মানবতা দিয়ে। সমাজের সবরকম কাজে সামাজিক উৎপাদনের সমস্ত বিভাগে, সব বর্ণের বা শ্রেণীর মানুষ নির্দ্বিধায়, নির্বিচারে যেন অংশ নিতে পারে। তবেই বর্ণগত সমাজের বিলুপ্তি ঘটিয়ে জাতপাতের অভিশাপমুক্ত একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে। আর মানবতার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হবে সমগ্র সমাজ, সমগ্র পৃথিবী।

বিংশ শতকের শেষ কয়েক দশক থেকে সাবলটার্ণ স্টাডিজ ও দলিতচর্চা বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক এগিয়ে এসেছেন এবং তাদের লেখনী সকলের গোচরে আসছে। বাংলার দলিত চর্চায় বিশেষ ভুমিকা রেখেছেন – পার্থ চ্যাটার্জী, রণজিৎ গুহ, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বসু, হিতেশরঞ্জন স্যান্যাল, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্ফিব্যাক, রূপকুমার বর্মণ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন গবেষণামূলক চর্চায় নিম্নবর্গীয়দের সম্পর্কে বিভিন্ন দিক উন্মোচিত করেছেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে জাতি রাজনীতি বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। তবে বেশকিছু ঐতিহাসিক একটি নির্দিষ্ট জাতির ইতিহাস তুলে

ধরার প্রয়াস নিয়েছেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মূলতঃ নমঃশূদ্র জাতিকেই আলোচনার বিষয়বস্তু করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় নমঃশূদ্র জাতিকেই ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে তপশীলিজাতির একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে দেখিয়েছেন। রূপকুমার বর্মণ তাঁর ইতিহাসচর্চায় বাংলার নিম্নবর্গীয় সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একইভাবে স্বরাজ বসু তাঁর গবেষণায় ১৯২০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজবংশী জাতির বিশেষ অবদান তুলে ধরেছেন। আবার মনোশান্ত বিশ্বাস তাঁর গবেষণায় বাংলায় মতুয়া আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে কৈবর্ত, মালো, পৌণ্ড্র, শুঁড়ি, বাগদি প্রভৃতি জাতিগুলির ইতিহাস শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাজ বসু বা মনোশান্ত বিশ্বাসের রচনায় স্থান পায়নি। আবার বাংলার রাজনীতিতে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জাতি বর্ণ রাজনীতি কিছুটা ধামাচাপা পড়ে গিয়ে শ্রেণীস্বার্থকে বড়ো করে দেখানো হয়েছে। তবে বাংলায় জাতপাতের রাজনীতি একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। একবিংশ শতকের প্রথম থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় পুনরায় জাতি রাজনীতি মাথাচাড়া দিতে থাকে। একদিকে যেমন মতুয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করতে থাকে। একইসঙ্গে বাংলার এক সময়ের নথিভুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিন্নভিন্ন হয়ে থাকা কৈবর্ত জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকাভিত্তিক আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। এছাড়াও কুর্মি, পৌন্ড্র, তিলি, তামলি, প্রভৃতি জাতিগুলিও তাদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া ও অধিকার আদায়ের অন্দোলন সংগঠিত করে চলেছে। ইদানীং কালে কৈবর্তদের বিশেষত চাষীকৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে উঠে আসছে। কৈবর্তজাতি আন্দোলনের শান্তিরঞ্জন সামন্ত, তন্ত্রীপদ বারিক, অপরেশ হালদার, সিদ্ধানন্দ

পুরকাইত, তারাপদ সামন্ত, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে তৎপরতার সাথে এই জাতি উন্নয়নের আন্দোলনকে সক্রিয় করে চলেছেন। অন্যদিকে মাহিষ্যনামধারী কৈবর্তদের অপর শাখাটিও নিজ জাতির উন্নয়নের জন্য সভা সমিতি, আন্দোলন করে চলেছেন। আর বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজের মাসিক মুখপত্র 'মাহিষ্য সমাজ' এই জাতির বিভিন্ন প্রচারকাজ চালিয়ে যান। বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির অগ্রগণ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাণী রাসমণির বংশধরের মধ্যে শ্রীমান কুশল চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত আই.পি.এস অমিয়কুমার সামন্ত, দুর্গাদাস মন্ডল, ভোলানাথ দাস, ড. শিশুতোষ সামন্ত, বিষ্ণুপদ দাস, সুবোধ কুমার হালদার, অষ্টম সাউ প্রমুখ। তবে বঙ্গীয় চাষী কৈবর্ত সমাজ, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমাজ, অ্যাসোসিয়েশন অব চাষী কৈবর্ত সমাজ, বঙ্গীয় চাষী কৈবর্ত (মাহিষ্য) সমাজ, ইত্যাদি নানান সংগঠনগুলি সকলেই প্রায় একই দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সকলের সম্মিলিত যৌথ আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়াস চালালেও তা কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের কারণে সফলতা পাচ্ছে না বলেই বেশ কিছু নেতৃবৃন্দের দাবী। তা সত্ত্বেও তাদের এই খন্ড খন্ড আন্দোলনের ফলেই একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রথমে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় প্রতিটি প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে কৈবর্ত(মাহিষ্য) জাতির উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের অঙ্গীকারসহ এই কৈবর্ত জাতির একটি অংশ মাহিষ্য নামাঙ্কিতদের অনগ্রসর হিসাবে ঘোষণা ও নানান উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে রাখেন। অর্থাৎ কৈবর্ত-সহ বাংলার বেশ কয়েকটি মুখ্য জাতি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। আগামীদিনে পশ্চিমবাংলার জাতপাতের রাজনীতি আরও সক্রিয় হবে সেসম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলই অনুভব করতে

পেরেছেন বাংলার কৈবর্ত জাতির পরিসংখ্যান তত্ত্ব ও তথ্য। আর তার ভিত্তিতে এই জাতি সংগঠিত হলে যেকোন রাজনৈতিক দলের ভাগ্যফল নির্ণয়ে নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে তা প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই নিশ্চিত। এককথায় এইভাবে বাংলায় কৈবর্ত জাতি পুনরায় একটি বলিষ্ঠ ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করার সম্ভাবনা গড়ে উঠবে।